কঠিন সুন্দর সত্য

আওয়ামি লীগের জাতীয় কাউন্সিল থেকে প্রত্যাশা

বেলাল বেগ

ডিসেম্বরে আওয়ামি লীগের জাতীয় কাউন্সিল সভা হবার কথা। রামের সিংহাসনে পাদুকার অবস্থান থেকে স্বীয় মূর্তি ধারন করার পর থেকে শেখ হাসিনা আওয়ামি লীগের জাতীয় কাউন্সিলকে ব্যক্তিগত রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত করেছেন। এর পরিণাম আওয়ামি লীগ বা শেখ হাসিনা কারো জন্যেই ভালো হয়নি। আওয়ামি লীগ ভেবেছিল শেখ হাসিনাকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নগুলি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। তখনকার আওয়ামি নেতৃত্বের দৈন্য দশা এবং অদূরদর্শিতাই প্রকাশ পেয়েছে ঐ চিন্তায়। সম্ভবতঃ তারা ভেবেছিল শেখ হাসিনা বাবার নামে কেঁদে আকুল হলে জনমনে উথালপাতাল ভাব আসবে এবং তারই তীব্র জোয়ারে আওয়ামি নৌকা ঝড়ের বেগে গন্তব্যে অর্থাৎ ক্ষমতায় গিয়ে পৌঁছবে। তখনকার নেতৃত্বের বালখিল্যতার কারণে রাজনীতির মৌলিক সমস্যাটাই তাদের মাথায় ঢোকেনি। তখন জামাত রাজনীতির ছাড়পত্র পেয়েছে। জামাতকে কে বা কারা কি উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল, জামাত বা মুসলিম লীগ রাজনীতি পুনঃচালু হলে মুক্তিযুদ্ধ অর্থহীন হল কিনা এসব আসল ব্যাপারগুলি খতিয়ে দেখার মত চৈতন্য যদি আওয়ামি লীগের থাকত, তাদের মধ্যে একজনও যদি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতা-নেত্রী থাকত তাহলে রাজাকারদের পদলেহন করে জীবনযাপনের গ-ানি আজ বহন করতে হতনা।

আজ একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়,স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লীগ স্বাধীনতার সুরক্ষায় সর্বোতভাবে ব্যর্থ একটি রাজনৈতিক দল।

প্রথমতঃ, এ দলটি এযাবৎ তার কোন আদর্শ এবং নীতি দলের ভিতরে বাইরে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শত্রুরা আমাদের পবিত্র সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি পদদলিত করেছে। ক্ষমতার লোভে তাদের সংগে হাত মেলাতে গিয়ে আওয়ামি লীগকে ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ এমন কি গণতন্ত্রের নীতিও বিসর্জন দিতে হয়েছে। এখন আওয়ামি লীগের আদর্শিক কোন পরিচয় নেই।

দ্বিতীয়তঃ, জাম াতের সংগে গোপন সমঝোতা এবং জাহানারা ইমামের মুক্তযুদ্ধ চেতনা পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের বিরোধিতা করে আওয়ামি লীগ বাঙালি জাতির ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের সংগে বেইমানি করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে অনীহা এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আওয়ামি লীগ নিজেই এখন ঐ সব শত্রুদের শিকারে পরিণত হচ্ছে। পুনরায় শক্তি অর্জন করে দাঁড়াতে না পারলে শত্রুরাই এবার আওয়ামি লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

তৃতীয়তঃ, আওয়ামি লীগ তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও সংগ্রামের পথে না গিয়ে ক্রমাগত ক্ষমতার রাজনীতি এবং ক্ষমতায় যাবার জন্য অর্থ, অস্ত্র, হুমকি, সন্ত্রাস প্রভৃতি সভ্যতা ও গণবিরোধী পন্থা ব্যবহার করার কারণে তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যন্ত নেতা-কর্মীগণ একধরনের হঠকারী আগ্রাসী মনোবৃত্তিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এরা আর কখনও সুস্থ রাজনীতির ধারায় ফিরে আসতে পারবেনা।

চতুর্থতঃ, শেখ হাসিনার হাতে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফলে পার্টিতে গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির বিলোপ ঘটে। পার্টির একজন নেতা কর্মীর সার্বক্ষণিক লক্ষ্যই হয়ে পড়ে শেখ হাসিনা এবং তার বিশ্বস্ত তল্পীবাহকদের কৃপাদৃষ্টি লাভ। এটাই আওয়ামি লীগের সমস্ত দূর্বলতা ও কোন্দলের মূল কারণ।

পঞ্চমতঃ, শেখ হাসিনার সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়ে নিজেদের দোষ ঢাকার জন্যে ক্রমাগতভাবে জামাতের দোসর বিএনপিকে দোষারোপ করতে থাকে। এমন কি তাদের লোক ভাগিয়ে পার্টিটিকে ধ্বংস করতেও উদ্যত হয়েছিল। ব্যাপারটি ব্যুমেরাং হয়ে গিয়ে বিএনপিকে প্রথমে আত্মরক্ষা এবং পরে আক্রমণে যাবার সুযোগ করে দেয়। এসময় বিরোধী দলকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করার মত যোগ্যতা ও দক্ষতা দেখাতে পারেনি আওয়ামি লীগ। যদি তা সম্ভব হত তাহলে জনগণ আর কখনও জামাতের মত উগ্র মৌলবাদী এবং বিএনপির মত সুবিধাবাদী দলগুলিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণ করতে দিতনা।

ষষ্ঠতঃ, আওয়ামি লীগের প্রায় সকল নেতা ক্ষমতার স্বাদ নিতে মন্ত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে নিজেদের রাজত্বকালেই দলটি সাপের খোলসের মত পরিত্যক্ত হয়েছিল। উদ্দেশ্যহীন, গতিহীন, শৃঙ্খলাহীন দলটি মূলতঃ সে সময় থেকে অবিন্যস্ত ও অসংগঠিত হয়ে পড়ে আছে।

আসলে কেউ সাহস করে বলেনা যে ডেকে এনে শেখ হাসিনার হাতে আওয়ামি লীগকে সঁপে দেয়াটাই ছিল মারাত্মক ভুল। শেখ হাসিনা বংগবন্ধুর কন্যা বটে, তাঁর মাঝে বংগবন্ধুর কোন গুণাবলী চোখে পড়েনি। একদল চাটুকার পরিবেষ্টিত থেকে শেখ হাসিনা বংগবন্ধু, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আওয়ামি লীগ এবং দেশের মারাত্মক ক্ষতি করে দিয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে দু'বার পরাজিত হবার পর জনগণ আওয়ামি লীগকে আর কখনও ক্ষমতায় দেবেনা।

তবে কি আমাদের জনগণ বাংগালি জাতীয়তাবাদ বিরোধী পশ্চাতমুখী সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে ভুল ছিল বলে গ্রহণ করবে ?

ব্যাপারটি নির্ভর করবে সরকার হিসাবে বিএনপি-জামাতের দক্ষতা এবং কৃতকার্যতার উপর। সাম্প্রদায়িকতাকে কৌশল হিসাবে ব্যবহারের আমেরিকান নীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে এ সরকার আমেরিকা এবং তার সেবাদাস সৌদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সহযোগিতা পাবে। ফলে সম্ভাবনা হচ্ছে এ সরকারের পাঁচ বছর ভালই কাটবে। আমাদের জনগণ যেহেতু রাজনীতি এবং রাজনীতিকদের প্রতি তিক্ত-বিরক্ত, যে সরকারই তাদের খাওয়া-পরা এবং রাতের ঘুমের নিশ্চয়তা দেবে তারাই জনগণের সমর্থন পাবে। বিএনপি যদি ঘুস, দূর্নীতি ও সন্ত্রাস দূর করতে বহুলাংশে সফল হয়, পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামি লীগের আর কোন আশা নেই। কেননা জনগনকে দেবার মত আওয়ামি লীগের যেমন আর কিছু থাকবেনা তেমনি আরও শক্ত হবে চারদলীয় ঐক্যজোট।

আমরা যারা একাত্তর সনে দেশবাসীর লাশের উপর হেঁটেছি, চার দলীয় জোটের রাজত্ব আমাদের কাছে একটি অপমানজনক পরাজয়। কোন সুস্থ স্বাধীন আত্মমর্যাদাশীল মানুষ ফেলে দেয়া থুতু চেটে খায়না। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ছিটেফোটা অবশিষ্ট থাকলেও বাঙালীর স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদার লড়াই চলবে।

প্রশ্ন হচ্ছে আওয়ামি লীগে আত্মমর্যাদাবান মানুষ থাকলে তাদের কি হবে?তাদের জানতে হবে :

১. এ আওয়ামি লীগের কোন ঐতিহাসিক ইমেজ আর নেই।

২. শেখ হাসিনার নেতৃতাধীন আওয়ামি লীগ আর বাজারে চলবেনা।

তাহলে তাঁরা কি করবেন ?

১. তাদের উচিত আওয়ামি লীগের শাসনতন্ত্র সংশোধন করে দলটিকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সংগঠিত করা। একাজটি সম্পূর্ণ করে তাদের উচিত হবে তৃণমূল পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সকল শক্তিকে এদলে এসে একসংগে কাজ করার জন্য আহ্বান করা।

২. আওয়ামি লীগের মূঢ় সংকীর্ণতা, হাসিনা-স্বৈরাচার, অর্থ-অস্ত্র-প্রভাবপ্রতিপত্তির

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

সন্ত্রস্ত জনপদের একজন বলছে

আনিসুল হক

ছোটবেলা থেকে একটা কৌতুক শুনে আসছি।

পুলিশ গেছে রাস্তায় ডিউটি দিতে। ২০টা গুলি বরাদ্দ ছিল।

ফিরে আসার পরে কর্তা গুলি বুঝে নিচ্ছেন। গুলি ফেরত এসেছে ১৫টা। বাকি ৫টা কই?

গুলি করতে হয়েছে তো স্যার!

না। আমি ৪টা গুলির শব্দ পেয়েছি। আরেকটা শব্দ গেল কই। নইলে আরেকটা বুলেট গেল কই।

আর পুলিশের জায়গায় গেছে আর্মি। ২০টা গুলির জায়গায় ফেরত এসেছে ১৫ টা গুলি। বড়কর্তা বলছেন, লাশ পাওয়া গেছে ৪টা। আরেকটা লাশ গেল কই!

এটা ছোটবেলায় শোনা কৌতুক। এর সঙ্গে আমাদের আজকের আলোচনার কোনো সম্পর্ক নাই। শুধু এটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশে এখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানোর আশায় সন্ত্রাসীদের পাকড়াও আর অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে। তবে তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

যাহোক, আশ্চর্যের কথা হয়তো নয়, দেশের সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর এই অভিযান বা সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দিয়ে সেনা অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছে। প্রথম আলো পত্রিকার অন লাইন জরিপে দেখা যাচ্ছে, ৮০ শতাংশের মতো মানুষ সেনা অভিযানকে সমর্থন করে। এমনকি বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নিরপেক্ষভাবে কাজ করা হলে তারা সেনাবাহিনীকে সমর্থন করতে প্রস্তুত আছেন। তবে, মানবাধিকার যেন লঙ্ঘিত না হয়, এ ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকতে বলেছেন।

সন্ত্রাসে সন্ত্রাসে বাংলাদেশের মানুষ আজ অতিষ্ঠ। তাদের মধ্যে নিরাপত্তার ন্যূনতম বোধটুকু আজ নেই। পানের দোকানদার, রাস্তার চিনাবাদামওয়ালা থেকে শুরু করে প্রাণ-এর মতো বড় প্রতিষ্ঠানের মালিক অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্তাকে পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়, না দেওয়া হলে মারপিট ভাঙচুর অপহরণ হত্যা নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঢাকায় ৪জন কমিশনার খুন হয়েছেন। আর খুনের পরে সন্দেহবশত যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা সবাই সরকারি দলেরই লোক।

সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রথম দিকেও দেখা যাচ্ছে, গ্রেপ্তার যারা হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই সরকারি দলের লোক। এর দ্বারা দুটো বিষয় অনুমান করা সহজ হয়ে যায় -

এক: সরকারি দলেই সন্ত্রাসীরা বেশির ভাগ আশ্রয় পেয়ে আসছে। এটা অবশ্য সব সরকারের আমলেই সত্য। সন্ত্রাসী তার নিজের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই সরকারি দলের আশ্রয়-প্রশ্রয় পেতে চাইবে। আর সরকারি নেতৃবৃন্দও তাদের ক্ষমতার জন্য, চাঁদাবাজিসহ নানা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের জন্য ক্যাডার পুষবেন, সন্ত্রাসীদের সন্তানস্নেহে পালন করবেন অর্থাৎ কিনা নেতৃবৃন্দ নিজেরা গডফাদারের ভূমিকা পালন করবেন। বাংলাদেশে যাবতীয় সন্ত্রাসের মূলটা এখানেই নিহিত। আজকে যে কমিশনারদের সন্ত্রাসী বলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, যারা গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি, তাদেরকে কেন আপনারা নমিনেশন দিয়েছিলেন? একদিকে আপনি সন্ত্রাসীদের দলের বড়ো বড়ো পদে নিয়োগ দেবেন অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বলবেন, এদের দমন করো এটা কি স্ববিরোধিতা নয়? আমাদের আগের প্রধানমন্ত্রীর অবশ্য স্ববিরোধিতা ছিল না। তিনি তার সন্ত্রাসী ও গডফাদার দলীয় নেতৃবৃন্দের মাথায় শাব্দিক অর্থেই হাত বুলিয়েছিলেন, জনসভায় তাদের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। এবারের নেত্রী সেরকম করছেন না। তিনি তাদের কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করাচ্ছেন। দলীয় এমপি গ্রেপ্তার হয়েছিল, দলীয় কমিশনারও গ্রেপ্তার হচ্ছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে বিএনপির স্থানীয় নেতাদেরও অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। অনেকেই পলাতক। এখানে কি আমরা এ প্রশ্ন করতে পারি, এই সন্ত্রাসীদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন কেন? কেন তাদের মনোনয়ন দিয়েছিলেন নির্বাচনে। কেন দলের নানা কমিটিতে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা স্থান পায়!

দুই: সরকারের উচ্চমহল, প্রধানমন্ত্রী নিজে, সম্ভবত সন্ত্রাস দমন করতে আন্তরিকভাবেই চাইছেন। সে কারণেই গোপনে অতর্কিতে এই সেনা অভিযানের সিদ্ধান্ত। অভিযোগ আছে, শীর্ষ সন্ত্রাসীরা আগেই খবর পেয়ে যায়, বিশেষ করে পুলিশের কেউ কেউ এদের খবর দিয়ে দেয়, সে কারণেই হয়তো পুলিশকেও জানানো হয়নি আগেভাগে। মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক রাত্রিবেলা করে বন্ধ রাখা হয়েছে একাধিকদিন। এখন দ্রুত বিচারের ট্রাইবুনাল করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

এসব থেকে যদি সুফল ফলে, তাতে জনজীবনে শান্তি আর স্বস্তি আসবে, এবং তার কৃতিত্ব অবশ্যই সরকারই পাবে, প্রধানমন্ত্রী পাবেন।

মনে রাখতে হবে, জনগণই ভোট দেয়। দলীয় সন্ত্রাসী ক্যাডাররা ভোট বাড়াতে পারে না, বরং ধ্বস নামাতে পারে।

সরকারের জনপ্রিয়তা এক বছরে অনেক কমেছে। বিরোধী নেত্রীর সভাসমাবেশগুলোয় আশাতীত লোকসমাগম হতে শুরু করেছে। আসলে বাংলাদেশের মানুষরা কত অসহায়, তারা একবার এর ওপরে বিরক্ত হয়ে ওর কাছে যাচ্ছে, আবার ওর ওপর বিরক্ত হয়ে এর কাছে আসছে। মুক্তি আর শান্তি তাদের জীবনে আর আসছে না। আসছে না কোনো বিকল্প শক্তি বা নেতৃত্ব।

সেনা অভিযানের ফলে বড় সন্ত্রাসীরা ধরা পড়লে, তাদের বিচারের সম্মুখীন করা গেলে পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হবে আশা করা যাচ্ছে। পাশাপাশি চিন্তা হচ্ছে, সেনাবাহিনী ফিরে গেলে তখন কী হবে? এই পুলিশের ওপরেই তো আমাদের ভরসা রাখতে হবে, নাকি! তাহলে তাদেরকে উন্নত করা, সৎ ও দক্ষ করা, আর তাদের ওপর থেকে দলীয় প্রভাব একেবারেই তুলে নেওয়ার চেষ্টা কি সরকার করবে?

২

সেনাবাহিনীর অভিযানের প্রথম ঝড়টা যাচ্ছে সরকারি দলের ওপর দিয়ে। কিন্তু বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর দিয়ে কি যাবে দ্বিতীয় ঝড়টা? প্রকৃত সন্ত্রাসী সে যে দলেরই হোক, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে জনগণ খুশিই হবে। কিন্তু প্রকৃত সন্ত্রাসী খোঁজার নাম করে বিরোধী মত ও রাজনীতি দমন করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নেবে না তো!

মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথাটা সব সময়ই প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কাজটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে, ব্যক্তির ওপরে যখন রাষ্ট্র চড়াও হয়। গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের নামে বা সময়ে কোনো রকমের নির্যাতন করাটা বেআইনি ও মানবাধিকার

পরিপন্থী। বিনাবিচারে আটক রাখাটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। কালো আইনের সাহায্যে সরকার তা কিছুটা সময় করতে পারে বটে কিন্তু তাতে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় না।

এই সব ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকা দরকার। আসলে সন্ত্রাসী বা চাঁদাবাজ গুণ্ডাপাণ্ডা চোরডাকাতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে মানুষ খুশি হবে। আর বিরোধী দল দমন করার নামে স্টিমরোলার চালানো হলে ক্ষমতাসীনরা নিজেদের কুয়ো নিজেরাই খুঁড়বে। জরুরি অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে করজোরে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল, ক্ষমতা আর জনপ্রিয়তা হারাতে হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর বাড়াবাড়ির গ-ানি আজ ২৮ বছর পরেও আওয়ামী লীগকে বইতে হচ্ছে।এই সরকারও যদি দমননিপীড়নের আশ্রয় নেয়, তার জন্য ইতিহাস একই রকমের স্থানই রাখবে।

৩

ঢাকার কতগুলো আবাসিক হোটেল থেকে অনেক তরুণী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অসামাজিক কার্যকলাপের।

পাশাপাশি প্রথম আলোতেই খবর বেরিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া গার্মেন্টস কর্মীরা দেহব্যবসার কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছে নিতান্ত দুমুঠো ভাতের জন্য, পেটের ক্ষুধায় অস্থির হয়ে।

সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়। বাংলাদেশে গত বছর বিদেশী বিনিয়োগ কমেছে আশঙ্কাজনক হারে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব বাড়ছে। বেকারত্ব বাড়লে সামজিক অস্থিরতা বাড়বে। সন্ত্রাস বাড়বে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি হবে। আবার আইনশৃঙ্খলা না থাকলে ব্যবসাবাণিজ্য হবে না, শিল্পায়ন হবে না, বিনিয়োগ হবে না। তখন আবার বেকারত্বের হতাশা বাড়বে। তখন আবার সন্ত্রাস বাড়বে। এটা একটা সাইকেল। এ থেকে বেরুনোর জন্য সরকার যদি কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমনে এগিয়ে আসে, তাহলে অন্তত একদিক থেকে কাজটা শুরু হলো, ভাবা যায়।

৪

আর দরকার দুর্নীতি আর দলীয়করণ বন্ধ করা। দুর্নীতির জন্য বিদেশীরা টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এটা খুব লজ্জা আর দুঃখের কথা। দলীয়করণের জন্য কোনো ব্যবসাপাতি মানুষ শান্তিতে করতে পারছে না। মানুষ চাকরিবাকরি করে শান্তি পাচ্ছে না। গত সরকার ছিল দলীয়করণের মাস্টার। এ সরকার তাদের ছাড়িয়ে গিয়ে হেডমাস্টারে পরিণত হয়েছে। দলীয়করণ যে অন্যায় এটা বলার লোকও আজ আর দেখা যাচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী কি এরপর বা এর পাশাপাশি সরকারের নিজেদের ভেতরের দুর্নীতি আর দলীয়করণের বিরুদ্ধে একটা অভিযানে নামবেন?

৫

এই সরকার অনেক ভোট পেয়েছিল। ভালো কাজ করার ক্ষমতা তার ছিল। সুযোগ ছিল। সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। তবে ভালো কাজ শুরু করার জন্য কোনো দেরিই দেরি নয়। আজই ভালো কাজ শুরু করলে আজই লোকে কৃতজ্ঞ হবে। দেশের মানুষ বোকা নয়। তারা ভালোমন্দের পার্থক্য বোঝে।

৬

এই কৌতুকটা কি আপনাদের মনে আছে। একটা পুলিশ সম্মেলনে গেছে বাংলাদেশ, ব্রিটিশ আর আমেরিকান পুলিশ।

তাদের বলা হলো, বন থেকে একটা হরিণ ধরে আনতে।

আমেরিকান পুলিশ এক ঘণ্টার মধ্যে একটা হরিণ ধরে আনল।

ব্রিটিশ পুলিশ একদিনের মধ্যে একটা হরিণ ধরে আনল।

বাংলাদেশের পুলিশ সাতদিন পরে ধরে আনল একটা ছাগল।

কী ব্যাপার, ছাগল কেন? হরিণ না ধরতে বলা হয়েছে!

বাংলাদেশের পুলিশ বলল, তিনদিনের রিম্যান্ডে খালি নিতে দেন, ওই ছাগল নিজেই স্বীকার করবে ও আসলে হরিণ। ❏

ঢাকা

অক্টোবর ২২, ২০০২।

বাংলাদেশোদ্ভুত বিলেতী কোটিপতিদের কথা

শামীম আজাদ

ধন-দৌলত কি স্ত্রী লিঙ্গ? লাখ টাকার মালিক হলে তাকে লাখপতি বলা হয় কেন? কেন কোটিস্ত্রী না হয়ে হয় কোটিপতি! নাকি লক্ষীর সূত্রে প্রাপ্ত বলে, সম্পদ ”নারী” আর পতি তার অধীশ্বর। যুগে যুগে যেভাবে বসুন্ধরা হয়েছে বীর ভোগ্যা। সাধারণত রাজা, সম্রাট, সওদাগর, বণিক এদের দ্বারাই সম্পত্তি হত করায়ত্ব। তাই হয়তো তাকে অধীশ্বরের মর্যাদায় ”পতি” বলা হতো এবং এখনো হয়! নারী কোটিপতি যে সংখ্যায় নগন্য তারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে সে নিয়ে অন্য একদিন ভালো বিতর্ক হতে পারে। আজ শুনুন বিলেতের বাংলাদেশী কোটিপতিদের কথা।

বেশ ক’বছর ধরে ’সান ডে টাইম্‌স’এ বেরোয় বিলেতের শীর্ষ ১০০০ বিত্তবানদের কথা। তাতে মহারানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যেমন তেমনি আছেন এশিয়ান কোটিপতি লেখক সালমান রুশদীও। কথা সেটা না। দুবছর আগে আমি হঠাৎ দেখি আমাদেরই অত্যন্ত পরিচিত সুহৃদ ব্রিটিশ-বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ইকবাল আহমদ এর নাম ৩৮৪তম স্থানে! আর সেটাই কথা। এদেশে শ্বেতাঙ্গদের পরপরই যে এশিয়ানরা এগিয়ে আসছে ধাই ধাই করে তা জানতাম। তবে তাতে আছেন মূলত: ইন্ডিয়ান, এটাই ছিল ধারণা। তাই খুব জানতে ইচ্ছা হয় এর এশিয়ান প্রেক্ষিতটি। আর তক্ষুনি কিনা যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র মূলধারার ইংরাজী পত্রিকা ”ইষ্টার্ণ আই”এর ”এথনিক মিডিয়া গ্রুপ” পাবি-কেশন্স থেকে বেরোয় বিলেতের ২০০ শীর্ষ এশিয়ান ধনবানের তালিকা সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন । সাড়া পড়ে যায় চারদিকে। বিত্তবানদের এই তালিকার সবচেয়ে নিচে যার অবস্থান তারও বিত্তের মূল্যমান কমপক্ষে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড। তালিকায় ইকবাল আহমদ অবস্থান পেলেন একুশতম স্থানে আর মুকিম আহমেদ হলেন একশ’ পঞ্চাশতম। আমরা বাংলাদেশী বাঙালিরা হলাম মহা খুশি। কারণ, একথা আর সবাইর মতো আমিও জানি আর যাই হোক এখানে দেশের মতো ব্যাঙ্কে ওডি করে, ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে, মন্ত্রী আমলাদের উৎকোচ দিয়ে ব্যবসা নিয়ে এবং তারপর টাকা বানিয়ে ধনাঢ্য হননি এরা কেউ। এদেশের হিসাবের খাতা বড় পরিস্কার। একারণে অনেকে নিউজ আইটেম হতেও চাননা। পরের বছর তাতে যোগ হয় নতুন নাম আমিন আলী আর এবছর হল বারি ব্রাদার্স দের নাম। কিন্তু এবারেরর প্রকাশনা আর এথনিক মিডিয়া গ্রুপের নয়। ”এশিয়ান এক্সপ্রেস”এর। তাদের প্রথম প্রকাশনায় আমরা নতুন মিলেনিয়ামে পেলাম চার বাংলাদেশী এশিয়ান মিলিওনেয়ার এর খবর। এই এশিয়ান এক্সপ্রেসের ব্যাপারটাও কাকতালীয় যার মালিকানা কিনা বাংলাদেশী। আহমদ পরিবারের মালিকানাধীন এশিয়ান এক্সপ্রেস তাদের পুরোনো কাজের ধারা অব্যাহত রাখতে গিয়ে এবছর বের করেন ২৫০ জন এশিয়ান মিলিওনেয়ারের কথা যার গবেষক ও গ্রন্থকার ডা: ফিলিপ ব্রেস ফোর্ড। তার মতে এশিয়ান কমিউনিটি অতি দ্রুত স্বয়সম্পূর্ণ এবং সাহসী হয়ে উঠছে, বিশেষত বর্তমান প্রজন্ম।

আজ এই চার কোটিপতির দুজনার কথা বলবো আপনাদের।

বাংলাদেশের অসীম সাহসী নাবিকেরা সেই প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কাল থেকে শুরু করে বিলেতে বসবাস গড়েছিলেন। জাহাজ থেকে বরফ শীতল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিম্বা বন্দরে নেমে মহারাণীর মুদ্রার ঝংকারে বিমুগ্ধ হয়ে। তাদের পথ লক্ষ করে আজ অবধি বিলেতে পাড়ি দেয়া রয়েছে অব্যাহত। তাই বলে এভাবে কোটিপতি হতে পারবে এমন আশাও করেনি। স্বপ্ন দেখেছে হয়তবা। আমাদের উত্তর পুরুষেরা সেই স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়েছেন সাধনা ও অধ্যবসায়। এর অন্যতম উদাহরণ বাংলাদেশী মিলিওনেয়ারদের মধ্যে শীর্ষস্থান এবং এশিয়াদের মধ্যে ১৯তম স্থানাধিকারী ইকবাল আহমেদ (৪৪)- ইকবাল ব্রাদার্স ও তার দুভাই কামাল ও বেলাল। তাদের সম্পত্তির পরিমান ৭৫ মিলিয়ন পাউন্ড। দুব’ছর আগে তাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ষাট মিলিয়ন পাউন্ড। তাই অবস্থানও উঠেছে একুশ থেকে উনিশ নম্বরে।

রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্মদিন উপলক্ষে বিট্রিশ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উলে-খ যোগ্য অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যাক্তিত্বকে বিশেষ খেতাবে ভূষিত করা হয়। এবছর এই প্রথমবারের মত আমাদের বাংলাদেশী কমুনিটি থেকে ব্রিটিশ শিল্পপতি ইকবাল আহমেদকে ডিপে-ামেটিক ক্যাটাগরিতে সার্ভিস টু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর জন্য অফিসার অব দি মোষ্ট এক্সেলেন্ট ” অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার” খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি হাসতে শুরু করেন। বলেন একটা কান্ড হয়েছিলো, আমিতো এই বিশেষ সম্মানের সংবাদ মিডিয়াতে ফলাও হবার আগেই আনঅফিসিয়ালি জানতাম। নিকট জনদের জানালাম, সবাই মিলে তা মহা ধূমধামে সেলিব্রেটও করলাম। কারণ কাগজ বেরুবে শনিবার তখনতো আমার এইসব সহযোগিদের পাবোনা। কিন্তু ভোর বেলা তিন চারটি সংবাদপত্রের সাধারণ ওবিই প্রাপ্তদের মধ্যে আর নাম খুঁজে পাইনা। মহা ব্রিবতকর অবস্থা। প্রায় পয়ঁতালি-শ মিনিট ছেলে-মেয়ে মিলে সবাই খুঁজছি। নেইতো কোথাও নেই। তখনই ছেলেমানুষের মত এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিলেতের বাইরে গিয়ে একমাস থাকার কথা প-্যান করে ফেললাম। এমন সময় মেয়েটি চিৎকার দিয়ে ওঠে, ”বাবা তুমিতো আরো ওপরের লেভেলেরটা পেয়েছো! তুমি পেয়েছে ডিপে-ামেটিক ক্যাটাগরিতে। বিলেতের জন্য সার্ভিস টু ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এর জন্য। তাই সাধারণ স্থানে তোমার নাম নেই।”

ব্রিটেনে বাংলাদেশোদ্ভুত
মিলিওনিয়ার ব্যবসায়ী
ইকবাল আহমদে

আমার মনে হল যে স্থানে তিনি উঠে গেছেন, তা নিয়ে গা চুলকানো নেই। আমার আরো ভালো লাগলো এই সম্মানকে আমাদের সকল বাংলাদেশী বংশোদ্ভুতদের জন্য বলে তিনি মনে করেন বলে। এটি এদেশে আমাদের ফেলে আসা দেশের ভাবমূর্তি উন্নত করবে বলে ইকবাল আহমেদ মনে

করেন। ইকবাল আরো বলেন,“ বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা না থাকলে দেশের উদ্যমী ব্যবসায়ীরা অনেক এগিয়ে যেতে পারতেন। তবে দেশে এইপথে অন্তরায় হল প্রশাসনিক বাঁধা। এমনিতে মুখে মুখে সকল মন্ত্রী মিনিস্টার থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আমাদের প্রবাসীদেরকে দেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দেন। কিন্তু কার্যত ফাইলের পর ফাইল যেন পাথর বাঁধা। প্রবাসীরা দেশের বাইরে থেকে যান। পাথর সরাবার সময় কোথায়? আরো যেহেতু দেশের 'আদায়ের' খেলাটির সঙ্গে তারা অভ্যস্ত নন তাই পরাজিত হয়ে হতোদ্দম হয়ে বিলেতে ফিরে আসেন। আর যারা এরই মধ্যে সঠিক পথে টিকে আছেন তাদের সত্যি প্রশংসা করতে হয়।”

ইকবাল ভ্রাত্রীত্রয়ের ব্যবসা হিমায়িত মাছের ” সি ফুড মার্কেটিং।” তাদের ব্যবসা বিলেতের মিডল্যান্ড ম্যানচেষ্টার কেন্দ্রীক শুরু হয়ে তা সমগ্র বিলেত ও ইউরোপ ছাড়িয়ে বহি:বিশ্বে এমন কি বাংলাদেশও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। এর অন্যতম আইটেম বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি যা এখানে ব-্যাক টাইগার বলে পরিচিত। গত বছর সম্পূর্ণ ব্রিটিশ উদযোগে নগদ টাকায় চাটগাঁয় খোলেন হিমায়িত পোলট্রি ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করার কারখানা। এর উদ্বোধন করেন রাজকুমারী এ্যান। কোপানীর নাম সি ফুড মার্কেটিং। সংক্ষেপে সিমার্ক। এরা চিংড়ির পাশাপাশি পোলট্রিও প্রক্রিয়াজাত করছেন। এক্ষেত্রে বিগত একযুগেরও বেশি সময় ধরে হল্যান্ড একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এখন তারা রিয়াল এস্টেট এবং ইনডাসট্রিয়াল এস্টেট ব্যবসায় যুক্ত হচেছন। সিমার্কের ৯০% পণ্য ইউরোপে রপ্তানী হয়। রপ্তানী ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্য ১৯৯৮এ কুইন্স এওয়ার্ড এবং ১৯৯৯এ ইউরোপিয়ান বিজনেস এওয়ার্ডেএ প্রথম স্থান অধিকার করেন। চাটগাঁ ছাড়া সিলেটে নিজ বিনিয়োগে স্থাপন করেছেন একটি শপিং কমপে-ক্স। ১৯৯৬ সাল থেকে ইকবাল প্রতিনিধিত্ব করছেন ব্রিটিশ ইনভেস্টমেন্ট-এর সাউথ এশিয়ান এ্যাডভাইজরি বোর্ডে। তিনি ক্রিস্টি ক্যান্সার রির্সাচ ফান্ড, ডির্পাটমেন্ট অব ট্রেড এ্যান্ড ইনডাসট্রি সহ নানা সংস্থায় স্বেচছাসেবা দান করে থাকেন।

স্বাধীনতার পর ইকবাল যখন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন তখন তিনি মাত্র এক ষোল বছরের তরুণ। তার বাবা আলহাজ আব্দুল খালিছ ছিলেন বিলেতের ” মিঞা এ্যান্ড সন্স”, যারা ছিল একসময় চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের একমাত্র পরিবেশক, তার মালিক। ইকবাল পড়াশোনা শেষ করে শুরু করেন সেখান থেকেই। তাদের আদি বাড়ি সিলেটের বালাগঞ্জে।

তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ” আর কি কাজ করার দরকার আছে? লোকে বলে এখন শুধু পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর খাবেন!”

– ” সত্যি বলতে কি, মোটামুটি একটা সাফল্য আসার আগে বসে আরাম করার কথা ভাবিইনি। আর এখন কাজ হয়ে গেছে আমার এডিকশনের মত। প্যাশনের মত। এখন কাজ করি আমার আড়াই হাজার কর্মীর বেতন জোগানোর জন্য, মাসান্তে ধার শোধের জন্য, বিল মেটানোর জন্য, একটি কাঙ্খিত ছুটির জন্য।”

- ” এর পরের টার্গেট কি? কোথায় পৌছাতে চান?”

-” স্কাই ইজ দা লিমিট। আরো মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই।”

-” আমাদের দেশের বড় লোকরা কি বলেন?”

– ” তারা ভাবেন এসব ছেলের হাতের মোয়া আর কি। লাইফ ইজ সো ইজি টু দেম। তারা কেউ কেউ লন্ডনকে গরীব দেশও বলে হেসেছেন। তাদের নিজস্ব জীবনধারা নাকি বিলেতের চাইতেও অনেক উন্নত।”

মিলিওনেয়ারদের মধ্যে ৭০তম স্থানাধিকারী মুকিম আহমদের (৪৬) সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশি দ্যাখা হয়, কথা হয়। সঙ্গত কারণেই। তার যে চেইন রেস্টুরেন্ট ”ক্যাফে নাজ” তার একটি একেবারে ব্রিকলেনের মধ্যমণি। এটি একসময় ছিলো নাজ সিনেমা। আর দ'ুবছর আগে ব্রিকলেনে যখন এক বর্ণবাদী তরুণ বোমা মেরেছিল, তখন পুলিশ ষ্টেশন সংলগ্ন রেস্টুরেন্ট হয় ক্ষতিগ্রস্থ। আমরা চোখের সামনে দেখলাম কী চমৎকারভাবে সেটি আবার গড়ে তুললেন তিনি আধুনিক ডিজাইনে। নিজে লেগে থাকতেন। এবার কিন্তু দেখা করতে আর পারলামইনা। এত তার ব্যস্ততা। কথা হল তার মোবাইল টেলিফোনেই। তার কিছুদিন আগে প্রথম আলোর টিপু সুলতানের জন্য আমরা যে চ্যারিটি ডিনারের আয়োজন করার জন্য উদযোগ নিতে চাচ্ছিলাম, তিনি সানন্দে তার কমার্শিয়াল রোড সংলগ্ন ” ক্যাফে নাজে” স্থান দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। রেস্টুরেন্ট ছাড়াও প্রপার্টি ব্যবসা, ইলেকট্রিকাল গুড্স, টাভেল, এজেন্সি সবই তার সম্পদের উৎস। প্রথমবার যে সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ দশমিক দুই মিলিয়ন, দুবছরে তার মূল্যমান হয়েছে পঁচিশ মিলিয়ন। তিনি লন্ডনেরই বাসিন্দা এবং তার ব্যবসার হাতে খড়ি ছাত্রাবস্থায়ই। পিতার আমদানী ব্যবসা থেকে তার হাতে এর সম্প্রসারণ ঘটে। তিনি ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্সের চেয়ার। মুকিম আহমদের আদি বাড়ি সিলেটের শেখঘাট।

'গরীব দেশের ধনীলোক' বলে- তার কেমন লাগে বলতেই প্রায় ক্ষেপে উঠলেন।

-” বাংলাদেশ তো গরীব নয়। কিছু কিছু মানুষের গরীব মানসিকতায় দেশের অর্থনীতি দাঁড়াতে পারছেনা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশের অবস্থা বিপন্ন করছে। দেশে কিন্তু অপরচুনিটির অভাব নেই।”

–” এভাবে চিহ্নিত ধনী হয়ে লাগছে কেমন?”

-” ভালো না। চাইনা কিছু লিখুন। বরং স্বামী সহ আসুন রেস্টুরেন্টে একদিন, খাবেন, গল্প করবো। এসব লেখার কোনো মানে নেই। বরং ঝামেলা বাড়ে।”❑

লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র।

কঠিন সুন্দর সত্য ৯ পৃষ্ঠার পর

অশুভ আঁতাতের মুখে দেশপ্রেমিক আওয়ামি নেতা-কর্মীরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে দলটিকে পুনর্গঠিত করতে ব্যর্থ হলে তাদের উচিৎ দলত্যাগ করে বৃহত্তর শক্তি গঠনে আত্মনিয়োগ করা। তাদের মনে রাখতে হবে এ আওয়ামি লীগকে ত্যাগ করলে কিছু যায় আসেনা কারণ এ আওয়ামি লীগ দেশ, সমাজ, মুক্তিযুদ্ধ সবই ত্যাগ করেছে।

আমরা সবাই জানি বৃটিশের ঔরসজাত সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তি এবং তাদের বাঙালি পোষ্যরা স্বাধীনতার পর থেকে নানা ষড়যন্ত্র করে, নৃশংসতম হত্যাকান্ড ঘটিয়ে বাংলাদেশ দখল করে নিয়েছে। আমরা আমাদের নানাবিধ দুর্বলতা, অযোগ্যতা, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে পারিনি। পারিনি বলেই আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শগুলি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় রাজনীতি প্রচলন করতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামি লীগ যেহেতু আমাদের তাবৎ স্বপ্ন পূরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, আমরা তাতে আমাদের জীবনমরণ সম্মতি দিয়েছিলাম। কিন্তু হাসিনা লীগ বঙ্গবন্ধুর আওয়ামি লীগ থেকে সরে গিয়ে ওটাকে বাবুরাম সাপুরের সাপ বানিয়ে ফেলেছে। অথচ আমাদের বাঁচার উপায় এখনও ঐ বঙ্গবন্ধুর আওয়ামি লীগ। শেখ হাসিনাকে এটা বুঝতে হবে। এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলে তিনি হয়তো আওয়ামি লীগের উপদেষ্টা সভায় একটা চিরস্থায়ী স্থান নিয়ে বংগবন্ধুর কন্যা হিসাবে দেশ ও জাতির সেবায় আমৃত্যু নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন এবং আওয়ামি লীগে নতুন নেতৃত্বের উত্থান ও বিকাশের পথ করে দেবেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশ আওয়ামি লীগের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির মুখাপেক্ষী থাকা সত্বেও আওয়ামি লীগ না জেনে নিজের পরশ পাথরগুলি নদীতে ফেলে দিচ্ছে। ❑

নিউ ইয়র্ক

অক্টোবর ১৫, ২০০২।